শিক্ষা ভাবনা - পাঠভবন

– অনুপ ঘোষ

সুকুমার রায় তাঁর ছড়া কবিতা 'বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই'-এ বলেছিলেন বিবিধ পুঁথি বিদ্যের আত্মগরিমাকারী বাবু যখন উত্তাল ঝড়ে ভাসমান নৌকায় জীবন বিপর্যয় অনুভব করেছেন, তখন মূর্খ মাঝি তাকে শুনিয়েছেন জীবন সংগ্রামের সাঁতার না জানতে পারলে সকল বিদ্যাই মিথ্যে। রূপক হিসাবে এই ছড়া প্রতি মুহূর্তেই মানুষের কাছে বিবেচ্য।

একটি শিশুর জন্মের পরেই প্রতি অভিভাবক চান তার সন্তান বড় হয়ে উঠুক। বড় হয়ে স্বাবলম্বী হোক। মনের মধ্যে তাদের বাসনা থাকে ভালো অর্থ উপার্জন করুক এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলুক। বর্তমানের যুগ হ'ল বিজ্ঞাপনের যুগ। সেই বিজ্ঞাপনে মোহিত হয়ে শৈশব থেকেই শিশুদের উপর যে বোঝা চাপানো হচ্ছে, তাতে মনে হয় না তারা প্রকৃতির জীব। প্রকৃতি থেকে এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে শিশু যদি এগিয়ে না যায় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে শিশু শৈশব কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বার প্রান্তে এসে কাগুজে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষ হওয়া এবং শিক্ষিত হবার মধ্যে যে পার্থক্য তা অভিভাবকদের ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপলব্ধি না হলে ছাত্রছাত্রীরা দিশা হারাবে। তাদের ব্যর্থতাকে আমরা আত্মসমালোচনা না করে তাদের উপরই দায় চাপাই। সুস্থ সমাজ গড়ার বদলে অসুস্থ সমাজ গড়ে তুলছি। স্থৈর্য, মনন, হৃদয়বৃত্তি, সৃজন ভাবনা ও সাহস এই পাঁচটি গুণ আয়ত্ত করতে হয় প্রকৃত মানুষ হতে গেলে। এই শিক্ষা দিতে গেলে প্রকৃত গুরুজন হয়ে উঠতে হয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কি শিখিবে কতখানি শিখিবে, সেটা পরের কথা। কিন্তু সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে এবং বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার, যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে সেইটাই গোড়ার কথা।" কিন্তু আমরা অধিকাংশই শিক্ষার মূল ভাবনা থেকে বিচ্যুত হই। শিক্ষা ভাবনা, আলোচনা এবং অগ্রগতির জন্য যে আত্মোন্নতির প্রয়োজন, চেতনার উন্মোচন প্রয়োজন ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টার প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা আমরা করি না। শুধু মাত্র নিজের দায়টি অপরের উপর চাপিয়ে দিয়ে ফলের আশায় দিনযাপন করি। আর ত্রুটি বা ব্যর্থতার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠি।

আজকের চরম ভোগবাদী সমাজে খ্যাতি-অর্থ-সম্পদ মোহে আবিষ্ট হয়ে অমার্জিত প্রতিযোগিতার লাইনে কে যে কখন দাঁড়িয়ে পড়বে কেউ জানে না। এই সমাজের সারা শরীরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে লোভ-লালসার ইন্দ্রিয় সুখ তৃপ্ত করার দুর্বার হাতছানি। এই হাতছানি অতিক্রম না করতে পারলে তো সমাজ টিকবে না। আজকের ধনবাদী সমাজ মানুষের চেতনায় বিষ ঢালছে যেন মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সমাজে শেখানো হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য। কিন্তু সমাজের দাবি প্রত্যেকে সকলের জন্য। কবি কামিনী রায় বহুদিন আগেই তার 'সুখ' কবিতায় শুনিয়েছিলেন –

"আপনারে লয়ে বিব্রত বহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যদি না গড়ে তুলতে পারি তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের কাছে কি উত্তর পাবে? সুবিধাবাদিতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কারে আবদ্ধ, নীতিহীনতা সমাজ বহিরঙ্গে চাকচিক্যে আধুনিক হতে পারে না। পৃথিবীর দেশে দেশে মনীষীরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বলে গেছেন সরল জীবন অতিবাহিত করো, উচ্চতর চিন্তার বুনিয়াদ তৈরি করো, তবেই শান্তি, স্বস্তি, তবেই সাফল্য। উপনিষদের চরৈবেতির ডাক এগিয়ে চল – সভ্যতার উচ্চস্তরে – মানবতার বিকাশে। এই ধারাই এগিয়ে দিতে হবে নতুন প্রজন্মকে সুকান্তের ভাষায় এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যেতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য।

কথাটা বলা যত সহজ বাস্তব তত কঠিন। এক অন্ধকারময় চিন্তায় মানুষকে নিমজ্জিত করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা হচ্ছে। বিশ্বায়নের দাপটে লুপ্ত হচ্ছে – সংস্কৃতি, মূল্যবোধ। ধ্বংস হচ্ছে আবহাওয়া মণ্ডল, সামাজিক অস্তিত্ব, পরিবেশ। মানুষের জন্মগত অধিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভাষা। মুনাফার দৌরাত্ম্যে বৈষম্যের ফলে মানুষের আত্মপরিচয়, অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। এই অবস্থায় শিক্ষাও আজ আক্রান্ত। মননে, মানসিকতায়, বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবক মণ্ডলী আজ বিভ্রান্ত। ফলে এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রকৃত শিক্ষাকে বজায় রাখতে, এগিয়ে চলতে দুরূহ কাজ করতে হচ্ছে।

পাঠভবন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই এক সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শকে অবলম্বন করে চলবার চেষ্টা করেছে। ২৮শে জুন ১৯৬৫ সালে কোলকাতায় পাঠভবন সোসাইটির মাধ্যমে যাত্রা শুরু

করে। ১৯৯২ সালের ১০ই আগষ্ট ডানকুনিতে সেই যাত্রা পথের নতুন সংযোজন হয়। ডানকুনির মনোরম পরিবেশ এর সুবিধা পাঠভবন এর শিক্ষা আদর্শকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। অনেক সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবে। কিন্তু সমস্যাকে অতিক্রম করেই তো সভ্যতার জয়যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় – 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই লড়তে হবে।'

পাঠভবন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় না, সহযোগিতা চায়। কারণ পাঠভবনের আদর্শ শৈশব কৈশোরে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মানুষ হয়ে উঠুক। পাঠভবনে এমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। শুধু মাত্র নম্বর পাবার ছকে সীমিত লেখাপড়া শিখে কৃতী ছাত্র হয়ে নয়। 'কেরিয়ার' গড়ার তাগিদে বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা প্রায়শই নম্বর পাবার ছকের বাইরে যেতে পারে না, চায় ও না। সেই ঘেরা টোপের বাইরে দিগন্ত প্রসারিত করে মানুষের সভ্যতার মশাল হাতে ধরিয়ে দিতে চায় পাঠভবন। পাঠ্য পুস্তকের বাইরে শিক্ষার যে বিপুল সম্ভার ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে তার দিকে তাকাতে হবে। ছোটদের থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পড়ানোর ব্যাপারে ধীরগতিতে এগোনো দরকার। প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা নয়। আনন্দের মধ্যে শিশুরা শিখবে, জানবে, ভাববে, শিক্ষিকাদের কাজ হল তাদের সাহায্য করা, অপেক্ষা করা। নম্বরের ইঁদুর দৌড় থেকে ছাত্রছাত্রীদের দূরে সরিয়ে রেখে সাজানো হয়েছে স্কুলের পঠনপাঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে। গ্রেডেশন পদ্ধতির মাধ্যমে মান বিচার হচ্ছে। সামান্য নম্বরের পার্থক্যে কোনো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে না। বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতার হাওয়া ব্যক্তির মানসিক অবক্ষয় ও আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়। তার মানবিক গুণ অপহরণ করে। তার থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তার থেকে পুরোপুরি দূরে থাকার উপায় নেই। তাই মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। এর মধ্যেই ছেলেমেয়েরা যাতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় তার জন্য সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে। গান, নাটক, ছবি আঁকা, শিল্প প্রদর্শনী, মেলা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়ানুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা আনন্দের সাথে বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে – ভয়ে নয়। মানুষের ইন্দ্রিয়কে সজাগ করার উপকরণ হিসাবে শিক্ষাকে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গীত, কলাবিদ্যা চর্চার গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সকলে ভালোভাবে পারবে না, তবে শোনা ও দেখার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েদের ভালো জিনিস গ্রহণ করার মতো চোখ ও কান তৈরি হয়ে যাবে। পাঠভবন এখানেই সার্থক যখন কোন অভিভাবক অভিযোগ করেন আপনারা গান নাচ খেলাধূলায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন – আর ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসবার জন্য মুখিয়ে থাকে। নিষেধ করলে – কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।